শম্পা ভট্টাচার্য

গল্প লেখার কারিগর: অদ্বৈত মল্লবর্মণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পাঁচ ছয় কিলোমিটার দূরের তিতাস পাড়ের গোকর্ণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মালো সমাজের অদ্বৈত মল্লবর্মণ। দেশকালের সীমারেখা পার হয়ে অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে পাঠকের হৃদয়ে তিনি বেঁচে আছেন বহু বছর। দারিদ্র্যের বর্ণহীন জীবন বহন করেও মানব জীবনের অনন্ত ঐশ্বর্যকে তিনি প্রকাশ করেছেন উদার ব্যাপ্ত মন নিয়ে, বিস্মৃতির গহ্বরে তাঁকে নিক্ষেপ করা তত সহজ নয়। শতবর্ষ অতিক্রম করেও তিনি মানব জীবনে উজ্জ্বল স্মৃতি নিয়ে উপস্থিত আছেন তাঁর অনন্ত সৃষ্টির জন্য। নানা অভিধায় ভূষিত তিনি —'ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার', 'অখণ্ড বাঙালি সত্তার প্রতিভূ', 'মালোবাসীর প্রতিনিধি'। ভাবতে বিস্ময় লাগে, অন্ধকারের তিমির গর্ভে শায়িত ছিলেন যিনি, সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে অল্প হলেও কিছু চর্চা চলছে; 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর লেখক সংকীর্ণ সীমা থেকে বেরিয়ে উজ্জ্বল কৌণিক বিন্দু থেকে প্রতিভাত হচ্ছেন।

তাঁর স্বল্পজীবী জীবনের কথা পরিচিত প্রায় সকলের কাছে। দে'জ থেকে প্রকাশিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র সম্পাদনা করেছেন শ্রী অচিন্ত্য বিশ্বাস। গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—'তবে এখনও আমরা মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বেঁচে থাকা জন-মজুর পরিবারের প্রতিভাদীপ্ত কথা সাহিত্যিককে পুরোপুরি অনুসরণ ও অধিগত করতে পেরেছি এমন দাবি করি না'[১] এই অংশটুকু থেকে আরও জানতে পারি যে, পাঁচ-ছ বছর ধরে নিরন্তর গবেষণাকর্ম চালিয়েও তাঁর রচনার সবটুকু উদ্ধার হয়নি; আর ২০১৬ তে প্রকাশিত 'অগ্রন্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ' গ্রন্থটির সম্পাদক অভিজিৎ ভট্ট ও মিলনকান্তি বিশ্বাস অচিন্ত্য বিশ্বাসের গ্রন্থে সমগ্রতার সন্ধান না পেয়ে অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপ্ত থেকে অনালোকিত লেখককে তুলে আনেন উজ্জ্বল আলোকবর্তিকায়; যার ভূমিকা অংশটুকু আমাদের কাছে অমূল্য তো বটেই; সেই সঙ্গে এমন আশা করাও অমূলক নয় যে অদূর ভবিষ্যতে অদ্বৈত রচনা সমগ্র পূর্ণাঙ্গ রূপেই প্রকাশিত হবে পাঠকের সামনে কোনো সহৃদয় গবেষকের সম্পাদনায়। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি 'অগ্রন্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ'-এর 'উপস্থাপনা' অংশটুকু—'এটি কোন অহল্যা ভূমি কর্ষণ নয়। এটিকে অদ্বৈত রচনাসমগ্র'র আগে লেখা রচনাসমগ্র'র সংযোজন হিসাবে দেখা যেতে পারে।[২]

সেই নিরিখে অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচিত ছোটোগল্পের সম্ভার আসে আমাদের সামনে; আর লক্ষ করি এযাবৎ তাঁর ছোটোগল্পের সংখ্যা আট। আটটি গল্পই মানব জীবনের এক একটি

বিচিত্র ভাবকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়েছে এবং এই ছোটো গল্পগুলি সম্পর্কে ভাবতে গেলে সমান্তরালভাবে পাঠককে আলোড়িত করে তাঁর ব্যক্তিজীবন, যেখানে সমালোচকের ভাষার অনুসরণে আমরা বলতে পারি, 'এই প্রখর আত্মসম্মানী ব্যক্তিটি স্বভাবনম্র এবং বিনয়ী হলেও স্বাধীনতাপ্রেমী, মানবতাবাদী এবং ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চিন্তার অনেক ওপরের স্তরের ও ব্যক্তি উর্ধ্বের মতাদর্শের প্রশ্নে কখনও আপোসরফা করেননি। মনে রাখার দরকার আছে, অদ্বৈত কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। সমাজ সংস্কারকও নন। তাই সোচ্চার ঘোষণাও নেই তাঁর লেখায়। নৈর্ব্যক্তিক বা তন্ময় দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ, জীবন ও সমাজকে দেখেছেন এবং অন্যদের দেখিয়েছেন। একারণেই তাঁর জীবনের মত লেখাতেও আবেগ থাকলেও মন্ময়তা নেই।'[৩]

পূর্বোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত গ্রন্থে যে চারটি গল্পের উল্লেখ পাই তার নাম অধিকাংশ পাঠকেরই জানা—'স্পর্শদোষ', 'সন্তানিকা', 'কান্না' এবং 'বন্দী বিহঙ্গ'। আর 'অগ্রন্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ' গ্রন্থে কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে চারটি গল্প—'বিস্ময়', 'জাল ফেলা জাল তোলা', 'তমোনাশের মন' এবং 'আশালতার মৃত্যু' এই আটটি গল্প পাঠে ধরা পড়ে লেখকের মানস চেতনা, জীবনবোধ এবং সমাজ চেতনা সম্বলিত কোমল ও সৃষ্টিশীল মনটি।

'সন্তানিকা' গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কোনো একটি সংখ্যা থেকে উদ্ধার হওয়া গল্প। ছোটো প্রাণ, ছোটো কথা-র কাহিনি ব্যক্ত করেছেন লেখক। গল্পের মুখ্য চরিত্র ধনঞ্জয় ঘোষাল স্বজনহীন বৃদ্ধ মানুষ; —'ভূষণের পারিপাট্য নাই, চুলগুলি উস্কোখুস্কো। অর্ধমলিন পাঞ্জাবির হাতটায় এক ছোপ কালির দাগ।' 'ছেঁড়া জামা' 'শত মলিন কাপড়ের পুঁটলি, শত তালি দেওয়া চটি জোড়া' সবই পাঠকের মনে ধনঞ্জয় সম্পর্কে একটা আবছা অবয়ব স্থাপন করে দেয়—গল্পটি পাঠ করতে করতে বোঝা যায় দরিদ্র হলেও তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান বর্তমান। সেই জন্যে তিনি গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে বীরেশবাবুর বাড়িতে কাটিয়ে দিতে চান তাঁর জীবন। সবিনয় নিবেদনে তিনি বীরেশবাবুকে জানিয়ে দেন 'তা একটু আধটু অসুবিধা হলেই বা, আমি সব চালিয়ে নিতে পারবো।' অতএব বীরেশবাবুর বাড়িতে তাঁর আশ্রয় জুটে যায় আর সে বাড়ির গৃহিণীও বাঙালি রমণীর মতোই মাতৃময়ী, কল্যাণের প্রতিমূর্তি। বৃদ্ধের প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি হয় না। অদ্বৈত মল্লবর্মণ চরিত্র নির্মাণে অতি দক্ষ। এ গল্পে তাঁর বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে ধনঞ্জয়-এর পড়ানোর প্রতি নিষ্ঠা, কাজের প্রতি সততা, বাড়ির সবাইকে আপন করে নেওয়ার বাসনা। নিজের জীবনের প্রতি অপার মমতা তাঁর, 'বেঘোরে মরাটাকে সে বড় ভয় করে। কোথায় কোন পথের পার্শ্বে বৃক্ষতলে, নদীতটে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়িয়া মরিবে, ভীষণ পিপাসার কালে ক্ষীণ কণ্ঠে জল জল বলিয়া চেঁচাইবে, কেউ শুনিবে না। তার ক্লান্ত নিমীলিত আঁখিযুগল বৃথাই আকাশে বার দুই মৃত্যুস্পর্শ হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিবে—কেহ দেখিবে না, কেহ শুনিবে না, ইহা সে বড় কষ্টের বিষয় বলিয়া মনে করে।' সুবিন্যস্ত বাক্যবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে ধনঞ্জয়ের জীবনতৃষ্ণা, জীবনের প্রতি মমত্ব স্পর্শ করে যায় পাঠক হৃদয়কে। স্বজনহীন এই মানুষটির আকাঙ্ক্ষা থেকেই উপলব্ধি করি যে, জীবনকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, স্বজনহীন মানুষ হয়েও পরকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে আছে তাঁর আত্মপরহীনবোধ। তার কামনা একটি 'সে

শুধু শান্তিতে মরিতে চায়...' দু-মুঠো ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই যে সে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে তা জানে তাঁর ছাত্র নরেশ। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে ধনঞ্জয়বাবু যখন নরেশকে প্রহার করেন, নরেশ তখনই শিক্ষকের জন্য নিয়ে আসে এক ডালা মুড়ি আর গুড়। আর একান্ত সরল মানুষটি মনে মনে প্রাণপাত আশীর্বাদ করেন তার ছাত্রকে আর কামনা করেন নরেশের দীর্ঘ; জীবন। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয়বাবুর পিছুটান বেড়েই চলেছে; তাই ছাত্র পড়াতে পড়াতে বেশি সময় তিনি গল্প করেন নানাবিধ মনোরঞ্জক গল্প, ফলস্বরূপ নরেশ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়; আর স্বভাবতই বীরেশবাবুর কঠোর মনোভাব ধনঞ্জয়কে করে ভীত ও সন্ত্রস্ত। শিক্ষক তাঁর ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে ভীত শঙ্কিত হন; 'একে সে বুড়া-থুরথুরে বুড়া হইয়া গিয়াছে—বাসশূন্য জীবনের তরণীটা যদি বা ভাসিতে ভাসিতে আশাতীতের মতো এখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে, একটা কিনারা সে পাইয়াছে, এই কূল হইতে তাহার ডুবো-ডুবো তরীটিকে ভাসাইয়া দিলে সে আর কূল পাইবে কিনা কে বলিবে।' কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মায়া মমতায় ঘেরা; অসুস্থতার সময় বীরেশবাবুর—গিন্নিমার বেদনাক্লিষ্ট মুখ তাঁকে সান্ত্বনা দেয় ঠিকই; কিন্তু তাঁর শিক্ষাদানে আস্থা রাখতে না পারা বীরেশবাবুর তাঁকে গৃহশিক্ষকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া—জাগতিক জীবনের আকর্ষণ বিকর্ষণকেই উপস্থাপিত করে যেন। সেই আশ্রয়স্থান থেকে বেরিয়ে গিয়েও একাকী মারা যাবার আতঙ্কে আবার ফিরে আসে বীরেশবাবুর গৃহে, গিন্নিমার স্নেহাঞ্চলে। একান্ত নিরাশ্রয় মানুষটির প্রতি অপার স্নেহে গিন্নিমা হয়ে ওঠেন চিরন্তন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। গল্পটি পাঠ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মৃত্তিকার মানুষের জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মমত্ব, অন্যদিকে মানুষের সাথে মানুষের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনে নারীর মঙ্গলময়ী ভূমিকা।

দিন যায় মাস যায়,বর্ষা যায়—এক এক করি
হয় অবসান
দুঃখ দুর্ভিক্ষের বোঝা দিনে দিনে হয়ে ওঠে ভারি
জ্বলে চিতা দাবাগ্নি সমান।

'স্পর্শদোষ' গল্পের প্রসঙ্গে এ উক্তিকেই যথার্থ প্রেক্ষাপট বলে মনে করা যেতে পারে। মানব ও মানবেতর প্রাণীর গল্প এটি। ভজা আর পথের কুকুর খেঁকির গল্প। একজন পথের কুলি মজুর বা ভিখারি, আর অন্যজন কুকুর, বড়োলোকের বাড়ির নয়। অন্ত্যবাসীর কথাই বলতে চান লেখক, মানবদরদ তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান উপকরণ। জীবন যুদ্ধে নামগোত্রহীন পথের বালক আর ক্ষুধা পীড়িত পথের কুকুর যেভাবে জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, তারই একটি চিত্র বর্ণনা করেছেন লেখক এবং ভাগ্যহত, আদর যত্ন থেকে বঞ্চিত, মানুষের অত্যাচারে মৃত কুকুর খেঁকি তার করুণ পরিণতিতে ভজার পরম স্নেহের হয়ে ওঠে, সেই স্বগোত্রের জীবনকাহিনি তুলে ধরেছেন লেখক।

ছোটোগল্প কাহিনি প্রধান হলে তা শিল্পের দিক থেকে ত্রুটি বলেই মনে হয়। অদ্বৈতের গল্প পড়তে গিয়ে যে ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, তিনি গল্পের মধ্যে নির্মাণ করেন এক একটি পরিস্থিতির বিন্যাস আর তাকে কেন্দ্র করেই জীবন সংগ্রামের রূপচিত্র। অবশ্য সব

গল্পেই যে সংগ্রাম বিদ্যমান, তা কিন্তু নয়—এ গল্পে যেমন আছে দু-একটি ব্যঞ্জনাময় বাক্য। যেমন—

১. দরিদ্র হওয়া কষ্টকর নয়। দারিদ্র্যের কুয়াশার ফাঁক দিয়া প্রাচুর্যের প্রতি ব্যর্থ কাহিনীটাই জ্বালাময়।

২. যে ব্যক্তি কৃচ্ছ্রতার ছিটানো কালির তিলক পরিয়া ও বুক জোড়া বুভুক্ষু নিয়া কাঁচের দরজার ফাঁকে রেস্টুরেন্টের সুখাদ্যের দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া কিছুকাল কাটাইয়া দেয়—তাহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা খচ্ করিয়া উঠে বৈকি।

৩. অভাব লইয়া যাহারা বাঁচে—অভাব তাহাদের গা-সহা। অভাব লইয়া যাহারা বাঁচে মানুষের বুকে দেয় তাহারা আঘাতের পর আঘাত।

এই উদ্ধৃতিগুলি উল্লেখ করার কারণ একটাই—তা হল গল্পে বর্ণিত ভজা চরিত্রটিকে স্পষ্ট করা। সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ভজা আর খেঁকির আলাপ। ভজা সারাদিন রাস্তায় ঘুরে কাগজের কুচি সংগ্রহ করে; আর খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য ভক্ষণ—সব ক্ষেত্রেই তার প্রতিযোগী খেঁকি। সর্বহারা মানুষের সঙ্গে পথের ইতর প্রাণীর যে সে অর্থে কোনো প্রভেদ নেই, তাই গল্পটির মূল থিম আর ক্ষুধার প্রতি আগ্রহ যে দরিদ্র মানুষের একান্ত স্বাভাবিক; তা লেখকের বর্ণনায় বিধৃত—'পঁয়ত্রিশ বছরের ভজা খাবার দেখিলেই পাঁচ বছরের বালকটি হইয়া যায়।' বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আঁকা হয়েছে এ চিত্র। তা বোঝাতে গিয়ে এসেছে সমব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিযোগিতা, ব্যর্থতা আর ভবিষ্যতের উদরপূর্তির চিন্তা। ভজা বিলাসী। ভিক্ষাবৃত্তি করে সারাদিনে একটি পয়সা পেয়ে তেলেভাজার দোকানে ঢোকে। আর খেঁকির পরিণতি আরও ভয়াবহ। চেহারায় শীর্ণতা এসেছে আর সেই সঙ্গে চক্ষুর তেজ নির্বাপিত হয়েছে; 'দোকানের ছাঁচে খাবারের এঁটো টুকরোগুলি অলসভাবে শুঁকিতেছিল।' গল্পের করুণ চিত্র পাঠকের মনকে আর্দ্র করে তোলে, যখন দেখি খেঁকিকে দেখলেই অঙ্গভঙ্গি করত, সেও খিদে মেটানোর জন্য সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হয়, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়—'খেঁকির উপর একটা পৈশাচিক আনন্দপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।' ঘটনার উপান্তে দেখি, খেঁকি ভজার কঠিন দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে পথচারী মানুষকে দংশন করেছে শাস্তিস্বরূপ জনতা প্রহার করে মেরে ফেলেছে খেঁকিকে। গভীর আবেগে খেঁকিকে নিজের বুকে টেনে নেয় ভজা। আসলে ভজা তখন বোঝে, সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে, ক্ষমতাহীনতার অবস্থানের দিক থেকে দেখলে কুকুরের সঙ্গে নিরন্ন কর্মহীন মানুষের মূলত কোনো প্রভেদ নেই। জীবনে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে যাকে একদা মনে হয়েছিল চরম প্রতিযোগী, মানুষের নির্মম প্রহারে সেই প্রতিযোগীই যে সমকক্ষতার দাবিদার হয়ে ওঠে, এমন অপরূপভাবেই নির্মিত হয়েছে গল্পটি। 'স্পর্শদোষ' গল্পটির সঠিক রচনার সময় জানা যায় না, তবে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর উক্তিটি উদ্ধৃত করি এখানে—"১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অদ্বৈত মল্লবর্মণের নিয়মিত কোন চাকরী ছিল না। 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনিয়মিতভাবে দু-একটি পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু কাজ করেছেন। সেই সময় লিখেছেন গল্পও। তারই একটি হল 'স্পর্শদোষ'। গল্পটিতে ১৯৪০-৪২ এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হিটলারের তান্ডবের উল্লেখ আছে। লেখাটি ১৯৪১-৪২ এর মধ্যে বলেই মনে হয়। ১৯৪৩ এর আগেই লেখা"।

'কান্না' গল্পে গুরুদয়ালের গল্পটি একেবারে অন্যরকম। বিপত্নীক চরিত্রটিকে নিয়ে গ্রামের মানুষের আলোচনার অন্ত নেই। একাকী বসে বসে সে বিরহের গান করে, কিন্তু গল্পের মধ্যে স্ত্রী সম্পর্কে কোঁনো মন কেমন করা ভাব লক্ষ করি না। বরং লোকজন তাকে সমবেদনা জানাতে এলে সে স্পষ্ট জবাবই দেয়—'আচ্ছা বল দেখি চিরদিনের জন্য কে সংসারে আসে? গানে আছে না, জন্মিলে মরিতে হবে খাঁটি জানাশুনা, দুদিনের তরে কেন এত বিড়ম্বনা! যে মরেছে সে বেঁচেছে।' পুরোনো আসক্তি ঝেড়ে ফেলতে পারে বলেই গুরুদয়াল দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ নেয়; এ নিয়ে এতই আলোড়িত সে যে গ্রামের লোকদের জানায়—'এমন বউ তোমাদের কারো ঘরে আসেনি। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যস্ত হলে যা হয়, এই বিবাহের সম্বন্ধটি ভেঙে যায়; কারণ কন্যাকে অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিলে কন্যার পিতা বেশি অর্থ পাবেন। গল্পের মধ্যে তরঙ্গের লীলা আন্দোলিত হয়ে ওঠে, যখন গুরুদয়ালের স্বভাবের মধ্যে খানিক বক্রতা চোখে পড়ে—'কি এক উৎকট আনন্দে গুরুদয়াল সহসা হাসিয়া উঠিল। এ যেন শ্মশানবাসীদের অট্টহাসি। কিন্তু সে যে কতখানি জ্বালা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার ইচ্ছা বুকে চাপিয়া এমনভাবে হাসিতে পারিয়াছে তাহার মুখের দিকে দেখিলেই তাহা ধরা পড়িত।'—ক্রোধ 'ও প্রতিহিংসার ইচ্ছা' পূরণ করেই দুমাস পরে গুরুদয়াল যাকে বিয়ে করে ঘরে আনল, সে 'বিশ্রী বউ'। কোনোকিছুতেই পুরুষ তার দিকে আকৃষ্ট হতে পারে না। এরপর বউটির পরিণতি সম্পর্কে যা জানা যায়, মা বাবা হীন মেয়েটি গুরুদয়ালের নিত্য নৈমিত্তিক প্রহার ও গঞ্জনার শিকার।

তিতাস নদীর পটভূমিকায় এ গল্পে লেখা। ঘটনাস্রোতে দেখি, গুরুদয়ালের সাথে নদীবক্ষে হঠাৎ দেখা পূর্বে বিবাহ নির্ধারিতা কন্যা আহ্লাদীর। আহ্লাদীর রূপের প্রতি আসক্তি গুরুদয়ালের মনের মধ্যে চকিতে উদিত হয়—'সে দুঃখদগ্ধ রূপহীন মুখখানার দিকে চাহিয়া কেবল ভাবিতেই লাগিল। ভাবিল এটা বড় অসহায়!' আহ্লাদীকে জীবনে পাওয়ার বাসনায় দিনের পর দিন স্ত্রীর ওপর চলতে থাকে প্রহার আর বারবার তার মৃত্যু কামনাও শেষ হয় না। কিন্তু 'মা চন্ডীর দয়ায় মারা গেল তার স্ত্রী। স্ত্রীর মৃতদেহের পাশে বসে গুরুদয়ালের অবিরাম ক্রন্দন গ্রামবাসীদের মনেও উদ্রেক করে করুণা। কিন্তু গল্পের শেষে গল্পকার জগদীশ গুপ্ত পাঠকচিত্তে উঁকি মেরে যান একটু; মানুষের মনে কোন রন্ধ্র দিয়ে কোন কামনা বাসনার যাতায়াত, তা জানার বাইরে। বোঝা যায়, গুরুদয়াল স্ত্রীর মৃত্যুতে কাতর হয়নি ততটা; সে আপশোশ করেছে মনের মধ্যে এই স্ত্রী কয়েকদিন আগে মারা গেলে হয়তো সে আহ্লাদীর সঙ্গে বিয়ে করে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত। আসলে দাম্পত্য জীবনেও কমবেশি মানুষের মনে থাকে অতৃপ্তির ফাটল। বিশ্রী বউকে নিয়ে গুরুদয়াল ঘর করলেও সে ব্যাপ্ত থেকেছে যৌবনের আরাধনায়। এ বুভুক্ষা একেবারেই জৈবিক। এ গল্পের শেষে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের উক্তিটিকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়—'কান্না গল্পটি অনেকখানি ভিন্ন গোত্রীয়। একটু ছন্নছাড়া ধরনের গুরুদয়াল এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র। নামকরণে করুণ রসের পরিচিত অনুষঙ্গ থাকলেও বয়ানের উপসংহারে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারি, গল্পকার আসলে নামের শ্লেষগর্ভ বিনির্মাণ করে নিয়েছেন। ...অদ্বৈত এই গল্পের শেষেও পাঠকের জন্য অপ্রত্যাশিত মোচড় রেখে দিয়েছেন। যার উৎস গহন মনের আলো-আঁধারিতে।'

'বন্দীবিহঙ্গ' গল্পটি কোনো ঘটনা প্রধান আখ্যান নয়। এ গল্পটি ছাপা হয় 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় ১৩৫২ সালের পৌষ সংখ্যায়। গল্পকার অদ্বৈত মল্লবর্মণের অন্তঃস্থলে যে একটি কবি মন শায়িত ছিল তার পরিচয় পেয়েছি এখানে। এই গল্পের নামকরণেই যেমন আছে প্রতীক বা ব্যঞ্জনার আভাস, তেমনি কাহিনির অন্দরমহলে আছে প্রিয়া বিচ্ছিন্না কম্পোজিটার আবু-মিয়ার স্বজনের জন্য মন কেমন করা ব্যাকুলতা। কলকাতা শহরে চাকুরিরত আবু মিয়া পুত্র কন্যা প্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃতির মধ্যে উন্মনা কবিমনটিকে মেলে ধরে। এ গল্প পাঠ করতে গিয়ে উন্মোচিত হয় অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন ভাবরসের লেখক। ছোটোগল্পের শিল্পকলায় তিনি দক্ষ ছিলেন বলেই হয়তো শুধু একটি চরিত্রের ভাবতন্ময়তাকে ঘিরে চারপৃষ্ঠার একটি ছোটোগল্প রচনা করতে পারেন। কোনো ঘটনার ঘনঘটা নেই, শুধু বিদেশে বাসকালে চাকরির বাধ্যবাধকতায় ক্লিষ্ট বন্দি বিহঙ্গ উড়ে যেতে চেয়েছে প্রিয়ার কাছে আর স্ত্রী জামিলার লেখা নিত্যদিনের ঘটনায় ছাপানো চিঠি তার কাছে এনে দেয় মুক্তির স্বাদ, মিলনের আশ্বাস।

গল্পের শুরুতেই গল্পকারের কবিত্বের পরিচয় মুগ্ধ করে মনকে। কবিত্বের সেই ভাষাটুকু দেখে নেওয়া যেতে পারে—'বারো মাসের ছটা ঋতু আবু মিয়ার মনে ছত্রিশ রকমের চিন্তা আনে। ফাল্গুন যখন বনে বনে রঙ চড়ায়, সে রঙে তারো মনে জাগে নেশা। এরপর জ্যৈষ্ঠের বাউল বাতাস আমের তলায় শুকনো পাতাগুলো ওড়ায়, তারো বুকটা শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে ওঠে। কলকাতায় বসে কিছুই দেখছে না সে, কিন্তু যখনই ভাবতে বসেছে, মনে হয়েছে তখনি, তাদের গাঁয়ের পাশে পুকুর পানে আপনি-ফোটা ফুলের বনের অস্তরাগ আর উদাস দুপুরের ঝরাপাতার মড়মড় খসখস শব্দ সবই দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে। বড় বড় দুতলা তিনতলা বাড়িগুলোর উপর দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে যখন মেঘ করে আসে, আর আসে একটা হাল্কা হাওয়া, তখন আবু মিয়ার বিশেষ করে মনে পড়ে একটি মানুষের কথা।' আরও দীর্ঘ উদ্ধৃত করা যেতে পারত এর পরের অংশটিও; কিন্তু তা করলে গল্পের অন্যান্য অংশের প্রতি অবিচার করা হয়। কারণ সে অংশগুলোও সমান উদ্ধারযোগ্য। তার চেয়ে বলা যেতে পারে, গল্পটি পাঠ করতে করতে পাঠকের মনে আঁকা হয়ে যেতে থাকে একটি বেদনা বিধুর ছবি—যেখানে আবু মিয়া চাকরি সূত্রে বাধ্যতামূলক কাজ করতে করতে ক্লান্ত আর মনের কোণে মুক্তির ডানা দেখায় জামিলা। 'জামিলার চিঠি যত লম্বা হয় ততই ভালো লাগে। তার লেখবার শক্তি অসাধারণ। পুকুর পাড়ে আলো-ছায়ার খেলা, উঠানে পড়ন্ত রোদের যাই-যাই ভাব, বন-বাদাড়ে পাখ-পাখালির কলরব এসব তো আবু মিয়া জামিলার চোখ দিয়েই অনেকদিন ধরে দেখে আসছে। জামিলা যা সুন্দর করে চিঠি লেখে। বিশেষ করে ছেলে দুটির নানান অকীর্তি-কুকীর্তি দুষ্টুমি-নষ্টামির কথা কি লোভনীয় করেই না সে জানাতে পারে। পড়ছি, না নিজের চোখে দেখছি, ভুল হয়ে যায় অনেক সময়।' সাপ্তাহিক খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদক আবু মিয়ার স্ত্রীর কাছে মৃদু অভিমানের খোঁচাও পায়—'তুমি সাংবাদিক। তুমি সারা দুনিয়ার খবর রাখ, শুধু একটা মানুষের মনের খবর রাখার বেলাতেই বুঝি তোমার ভুল হয়!'

পশুপতিপুর গ্রাম কোলকাতা থেকে কতদূর জানা নেই, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ দূরত্বে জীবিকার তাগিদে বাধা পড়ে আছে যে জীবন, তার মনের অন্দরে শুধুই খেলা করে পিতৃ হৃদয়ের

হাহাকার, কচি শিশুদের জন্য উতলা হয় মন, জুবেনাইল জেলের উঁচু পাঁচিল আর তার ওপর তার কাঁটা তারের সারির অন্তরালে থাকা জেলের ছেলেদের বন্দিদশা একাকার হয়ে রমু-জমুর বন্দিদশার সঙ্গে। আবু মিয়ার খালি মনে হয় এরাও কি বন্দি বিহঙ্গ? ওদের কি আটকে রেখেছে সে ও তার স্ত্রী? এই বেদনার ভার নিয়েই গল্পের অন্তিমে পৌছে যাই আমরা; যেখানে জামিলার চিঠির কবিত্বময় ভাষা দিয়েই গল্পের শেষ—'আবু মিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে চলল; সেদিন তোমার ছেলে দুটো করল কি, না একটা পাখি ধরে আনল; এনে খাঁচায় পুরল; খাঁচার বন্ধনে পড়ে পাখিটা লাগল ছটফট করতে। খাবে না, নাবে না, কিছু করবে না, খালি খালি ডানা ঝাপটাবে।

শেযে তোমার মেয়েটা করল কি , না খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে ছেড়ে দিল।'

এর না হয় কোনো ব্যাখা, না বিশ্লেষণ। শুধু একটি যোগসূত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়ে গল্পটির প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। জামিলার প্রথম চিঠিতে ছিল তাদের কন্যা সন্তানের প্রসঙ্গ; যেখানে বাবার কথা প্রসঙ্গে পাঠক জেনেছিল; বাবার কথা এলেও ওই ছোট্র মেয়েটি 'এমন করে কোন এক দিকে চেয়ে থাকে যে, মনে হয়, কোন সুদূর বুঝি তাকে ডাকছে; এখনি বুঝি সে ছুট দেবে'; এই ভাষায় এটাই তো অনুরণিত হয়, আবু মিয়া তার মেয়ের কাছে পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গ; তাই বুঝি নিজের বাড়িতেও পাখিটিকে মুক্তি দিয়ে যেন বাবার অবরুদ্ধ সত্তাকেই মুক্তি দিতে চেয়েছে।

সমালোচক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—'আসল কথা, ঘটনা, চরিত্র বিষয়-অবলম্বন যাই হোক, তাকে একটি নিজস্ব জীবনবোধিতে, একটি দর্শনে, একটি স্বগত ভাবলোকে পৌছে দেওয়াই আসল কাজ বলে গল্পকার মনে করেন।' এ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলাম কেন এবং তা অদ্বৈতর গল্পে কতটা প্রতিফলিত, সে প্রসঙ্গে আসছি পরে; কিন্তু যে গ্রন্থটির কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, তা হল অভিজিৎ ভট্ট এবং মিলন কান্তি বিশ্বাস সম্পাদিত 'অগ্রন্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ' গ্রন্থটির কথা। এখানে সন্ধান পাই অদ্বৈত রচিত আরও চারটি গল্পের কথা—'বিস্ময়', 'জাল ফেলা জাল তোলা', 'তমোনাশের মন', 'আশালতার মৃত্যু'। এই চারটি গল্পের সাধারণীকরণের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন সম্পাদক মহাশয়দ্বয়, যেখানে বলা হয়েছে—''চারটি গল্পে বিবৃত সামাজিক পরিমণ্ডল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কুশীলবেরা সবাই উচ্চবিত্ত দূরের কথা, উচ্চ মধ্যবিত্তের সামাজিক গন্ডির বাইরের মানুষ। নিম্নবিত্ত থেকে অন্তের্বাসী এবং শ্রীপতি ('বিস্ময়' পশ্য) এবং তমোনাশ ('তমোনাশের মন' পশ্য) ছাড়া প্রত্যেকেই দারিদ্র্য পীড়িত। শুধু তাই নয়, 'বিস্ময়' ও 'তমোনাশের মন' বাদে অন্য দুটি গল্পে ভাত-কাপড়ের সংস্থান থেকে অনাহার-মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ার, নিঃসম্বল করে দেওয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতিক তত্ত্বের (panperization) সামাজিক প্রতিফলন, স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এরা সবাই নগর জীবনের বৃত্তের বাইরে, সহজ সরল অনাড়ম্বর পল্লীসমাজের, চাষী-জেলে-ছোটোখাটো খুচরো ব্যবসায়ী। গল্পে বর্ণিত এদের সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার—সবই গ্রামীণ। অজপাড়াগাঁয়ে আজন্ম লালিত এবং পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত হলেও মানসিক যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকায় অদ্বৈত এই সমাজটাকে খুব ভালোভাবে

চিনতেন।"[৪]

'বিস্ময়' গল্পের শ্রীপতি চরিত্রটি জীবিকা সূত্রে টিকিট কালেক্টর আর টিকিট চেকের মাধ্যমে তার চরিত্রের কোমল কঠিন মনোভাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে পাঠকের। অসচ্ছল তৎকালীন বঙ্গদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই যে টিকিট কাটার সামর্থ্য ধরে না, তা গল্পের সূচ্যগ্রে জানতে পাই। নিস্তব্ধ পল্লী প্রকৃতির মাঝে তার কর্তব্য নিষ্ঠার মাঝে জাগ্রত হয়ে থাকে একটি করুণ রাগিণী—তার বিগত স্ত্রী সরযূ। মাত্র এক বছরের নবদাম্পত্য ভাগ্যের করুণ পীড়নে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আকস্মিক রোগের প্রকোপে। লেখকের বর্ণনাটিও ভারী সুন্দর—'ঘরখানা যেন লক্ষ্মীহীন গোলকধামেরই মতো শূন্য মনে হইয়াছিল। ঘরের যে যে দ্রব্যগুলিতে সরযূর হাত পড়িত সেইগুলি যেন সেদিন শূন্য মনে শ্রীপতির দিকেই একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল।' গল্পটি পাঠ করতে গিয়ে কাব্যিক ইমেজ ধরা পড়ে বারবার। এ কাহিনিতে ঘটনার বাহুল্য নেই ততটা; কিন্তু স্ত্রী বিচ্ছিন্না শ্রীপতির মনের বিরহ বেদনা গল্পকারের শব্দ ও বাক্য চয়নে এক শূন্যতার বাতাবরণ তৈরি করেছে। ঘটনাক্রমে পল্লীগ্রামে মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে নির্জন পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে কিন্নর কণ্ঠে বিরহের গান শুনে মোহিত হয় শ্রীপতি। বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাহিত হতে থাকা আর এক বিরহীর সুরমূর্ছনা শ্রীপতির নিঃসঙ্গতাকে আরও গভীর করে। এ গান শুনে 'সরযূর হারানো ব্যথাটা আবার দ্বিগুণ ভাবে জাগিয়া উঠে। গানের সুরে এতখানি মাধুর্য থাকিতে পারে, গানের সুর দূরগত ব্যথাটাকে এত করিয়া নিকটে ডাকিয়া আনিতে পারে শ্রীপতি জীবনে ভাবে নাই। চির অতৃপ্ত নেশা আচ্ছন্নের মতোই সে সব কয়টা জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উৎকর্ণ করিয়া সেই সুর এবং ভাব অনুভব করিতে থাকে।' এই সংগীতই তার জীবনে নিয়ে আসে বিনোদিনীকে। গায়িকা রমণী, বিধবা বিনোদিনীকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করে শ্রীপতি—সেই বিরহের গান শুনতে, যা তার মনে সরযূর সুখস্মৃতি জাগরূক করে। মানব মনের স্বপ্নচৈতন্যকে তুলে এনেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। মনে প্রশ্ন জাগে শ্রীপতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন কেন? বিনোদিনীর গানে মুগ্ধ হয়ে, নাকি বিনোদিনীর গানের মধ্যে দিয়ে সরযূকে মনের মধ্যে উজ্জ্বল করে রাখতে? এদিকে বিনোদিনী জীবনে আবার সন্ধান পেয়েছে তার প্রিয়তমর। আর সে গাইতে চায় না বিরহের গান। তাই বিনোদিনীর প্রেমময় সুর তার কানে বিষের মতো ঠেকে। অপূর্ব ভাষা চয়ন করেছেন লেখক—'যে পাখি কাঁটায় বসিয়া বেদনার সুখ বর্ষণ করিত, সে আজ কুসুম স্তবকে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া কেমনে সুধা বর্ষণ করিবে। তার সুর যে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেছে ।' কিন্তু এ যে জীবনের উপরিতল। কিন্তু জীবনের গতি বক্রপথেও চলে। যে সরযূর বিরহে বিনোদিনীকে পেয়েও শ্রীপতি ক্রন্দন করে, তার প্রেমের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু গল্পের সমাপ্তি সূচক বাক্যটিই যেন গল্পটিকে সার্থকতার শীর্ষে নিয়ে যায়, যেখানে বিনোদিনী সম্পর্কে লেখক বলেন—'কিন্তু একথা কোনমতেই বুঝিতে পারে না, তার জন্য কেন স্থান নাই, সে কি অপরাধ করিয়াছে।' ছোটোগল্পের সার্থকতা বোধহয় এখানেই, যখন তা পাঠকের মনের মধ্যে বিস্ময় অথবা প্রশ্নের আবর্ত তৈরি করে, দুটি হৃদয়ের অপূর্ব মিলনে কবে সার্থক হয়ে উঠবে তাদের দাম্পত্য, সে প্রত্যাশাতেই গল্পটি পৃথক মর্যাদা পেয়ে যায়।

আঞ্চলিক শব্দে পরিপূর্ণ আর একটি গল্প 'জাল ফেলা জাল তোলা'। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় এ গল্পটি রচিত। জেলে পরিবারের দুই ভাইয়ের কাহিনি। পরিবারে আদিম বৃত্তি মাছ ধরা, কিন্তু আর্থিক অনিশ্চয়তায় গল্প কথকের দাদা স্বজীবিকার মানুষের ভালোবাসা—শ্লেষ সবকিছু তুচ্ছ করে কৃষি জীবিকাকে গ্রহণ করে। মালোপাড়ার মাঝিদের জীবন সংস্কৃতি আমরা আগেও পড়েছি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে; এই গল্পেও দেখি, জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য এই 'দাদা' হাল ধরার সংকল্প করে। গ্রামের লোকেরা তাকে উপহাস করতে ছাড়ে না—'কি লইদাবাসী, তুমি কি জালের কাম ছাইড়া হালের কাম শুরু করলা নাকি? আছিয়া জালুয়ার ছেইলা, তখন অইলা হালুয়ার ছেইলা।' দাদা আবার নিজেকে 'হালুয়ার ছেইলা' বলতে নারাজ, সে বলে 'হালুয়া'। বোঝাই যায়, পিতৃতান্ত্রিক জীবিকাকে স্বতন্ত্র করে নিতে চাইছে; জেলে সম্প্রদায় রাতে জেগে জেগে মাছ ধরা ঈর্ষা জাগায় তাদের মনে আর নিদ্রা পরিতৃপ্ত দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে সকলে 'জেলের পুত হালে যায়, জালের দিকে ফিরে চায়'। স্বল্প পরিসরে গল্পের মধ্যে স্ববৃত্তির মধ্যে বিবাহ দেওয়ার যে রীতি ছিল, তাও উল্লিখিত আর এই দাদার বিবাহের প্রস্তাবেও দেখি জালুয়ার সঙ্গে হালুয়ার বিবাহ প্রস্তাবে বৃত্তিভেদ মুখ্য এবং অপূর্ব সুন্দর একটি বাক্য উপস্থাপিত করেছেন তিনি—'এ সংসারে জালে আর হালে কোন প্রভেদ নেই। জালুয়াতে আর হালুয়াতেও ভেদ করা চলে না। চাষীরা চাষ করে মাটির বুক, আর জেলেরা চাষ করে গাঙের বুক। চাষারা তোলে মাঠের ফসল আর জেলেরা তোলে গাঙের ফসল মাছ। চাষারা মাটিতে চালায় কাঠের লাঙল, আর জেলেরা জলে চালায় জাল-বাঁধা বাঁশের লাঙল। কাজেই জেলেও যা, চাষাও তাই' কিন্তু মালোই হোক আর কৃষিজীবীই হোক, জীবনযুদ্ধে সব শখ পূর্ণ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন আর ফিসারী ব্যাঙ্ক তার থাবা নিয়ে হাত বাড়াল জমি জিরেত যা কিছু ছিল তার দিকে। ফলে জেলে হারাল তার নাও আর জাল এবং দাদাকে বিক্রি করতে হল জমি। গল্পকথকের বক্তব্য আমরা শুনি—'এখন সংসার থেকে যাওয়াটাই যেন কাম্য, অনাহারে শুকিয়ে বেঁচে থাকাটা যেন মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক অবাঞ্ছনীয়।' কিন্তু দিন দুর্দিন হল। ফলে মহামারির প্রকোপে দাদার স্ত্রীর শুধু মৃত্যু হল না, সেই সঙ্গে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা একে একে বিক্রি করতে লাগল তাদের জাল, নৌকো সব। চাল হয়ে গেল দুর্লভ। জলের থেকে মাছও যেন উধাও। এ এমন এক দুঃসময়, যখন মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সাধ—সবই অস্তমিত। তাই গল্পের শেষ অংশে চমক ঘনিয়ে ওঠে। দেখা যায় নদীর বুক থেকে জলের মধ্যে থেকে জালের মধ্যে উঠে এসেছে নারীর মৃতদেহ। যে নারী ছিল বক্তার কাঙ্ক্ষিত, তারই মৃতদেহ গল্পের মধ্যে ট্রাজিক রসকে ঘনীভূত করে তোলে, দাদার দেওয়া অভিশাপ, মাথায় শোলার 'মটুক' না ওঠার শাপ যেন তিতাস নদীর এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ধ্বনিত হতে থাকে।

'তমোনাশের মন' গল্পের আর একটি টিকিট কালেক্টরকে পাই। বিনা টিকিটে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিয়মিতভাবে টিকিট কাটাকে আবশ্যক বলে মনে করে না। জীবনের থেকে তারা শিখেছে দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই জীবনের চক্র আবর্তিত। গামছা তোয়ালে তারা চেকারদের

প্রচুর পরিমাণে এমনিই দিয়েছে, কাজে কাজেই তারাও ভাবে টিকিটের দাম লুকিয়ে আছে ওই বদান্যতার মধ্যে। তমোনাশ ভাবে 'বস্ত্র ভেট দিয়ে এরা ট্রেন বাবুদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে রেখেছে। এদের বেলা তাই সবাই রুদ্ধকণ্ঠ।' জীবনকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে দেখার মন ছিল গল্পকারের। নিপুণ ভাষাভঙ্গিতে কখনও তিনি বলেন, 'শুধু উদরের প্রয়োজন নিয়ে ঘুরলে সব মানুষ পাগল হয়ে যেত।' তাঁর ভাষা অনুসরণে বলা যায়—'নিত্যকার মাছ-ভাতের উপাদান নিয়ে যারা ঘর্মাক্ত কলেবরে সারাদিন দাঁড়িপাল্লা চালিয়ে অন্যকে কথা হাত-মুখ ও নাড়ির অনেক শক্তি অপচয় করে গলদঘর্ম হয়, তাদের উপবাস করেই যেন হাটের প্রত্যন্তে পশরা সাজিয়ে বসে মনোহারী দোকানদারেরা। ...শোরগোল নাই, ব্যস্ততা নাই, তত দরদস্তুর নাই। কেনে যারা তারা কেউ চেয়ে ধিকৃত হয় না। হাটের এ অংশ বড় বিলাসী, বড় খেয়ালী।' তমোনাশ টিকিট কালেক্টর। বহু যাত্রীর সঙ্গে তার ওঠা বসা হলেও বিবাহও করা হয় না আর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও যোগাযোগ কম। এই নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা কাটাবার জন্যেই মাসির বাড়িতে তার যাওয়া; বিনোদিনীর গান শুনে মনের মধ্যে মুগ্ধতার সঞ্চার তাকে কাব্যিক করে তোলে—'এখানে পুবের গাঁয়ের নারকেল গাছের মাথায় যে সূর্য ওঠে বর্ষার নদীর জলে তা ভেঙে শতখান হয়ে সন্ধ্যায় মুঠা মুঠা আবীর ছড়িয়ে দিয়ে অলসভাবে ডুবে যায়। রাতে যে চাঁদ ওঠে, সাপলা ফুলেরা তাকে বুকে করে চোখ বুজে আত্মসমাহিত হয়ে থাকে।' এই পরিবেশে গায়িকার গলায় স্বর কানে শুনে তমোনাশের আশ মেটে না। গায়িকার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে নৈরাশ্য ও বিরহের নীরন্ধ্র অন্ধকার। ওই শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে রমণী কণ্ঠের সুরমূর্ছনা তার মনে বিচিত্র ভাবলোকের সঞ্চার করে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, রমণীর গানের কথা আর তমোনাশের হৃদয়াস্থিত বিচ্ছিন্নতা একাকার হয়ে যায় যেন। যার ফলশ্রুতি বিনোদিনীকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত। তমোনাশ নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তার বারবার মনে হয়—'আমি চাই কাকে? তাকে না তার গানকে? তার জন্য তার গানকে চাই না তার গানের জন্য তাকে চাই?' তমোনাশ স্ত্রীকে পীড়াপীড়ি করে আগের গাওয়া সেই গান গাওয়ার জন্য। বিনোদিনী সে গান আজ আর গাইতে চায় না। কারণ আজ তো সে বিচ্ছিন্ন নয়, কাছ পেয়েছে তার প্রিয়তমকে। এখন সে গাইতে চায় প্রেমের গান, মিলনের সংগীত। মধুর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে—'ও গান আমি কি গাইতে পারি?' বধূ নিবেদন করতে চায় নিজেকে, সংগীত যে উপলক্ষ্য, তা যেন বুঝিয়ে দিতে চায় বারবার। তমোনাশের হৃদয় খুঁড়ে জেগে ওঠে বেদনা। সে মানুষটিকে বোঝ 'কাঁটায় বুক ফুঁড়িয়ে গানের মধু ঢালা যে পাখির স্বভাব, ফুলের পাপড়ির কোমলতায় গা ঢেলে দিয়ে সে পাখি সে সুর হারিয়ে ফেলে।' গল্পের শেষে মানব মনের অস্থিরতাই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে যেন; আত্মসমর্পিত নারীর একাগ্র প্রেমকেও তুচ্ছ বলে মনে হয় তার। খুব অবাক লাগে, এর আগে 'বিস্ময়' নামাঙ্কিত যে গল্পটি পাঠ করেছি আমরা, সেখানে নায়িকা ছিল বিনোদিনী এবং গান শুনে মুগ্ধতা বশতই সে গল্পের শ্রীপতি বিধবা বিনোদিনীকে বিবাহ করেছিল। একই ভাবনার দ্বারা প্রাণিত হয়েই এই দুটি গল্প লিখেছিলেন গল্পকার। রচনাকালের দিকে তাকালে দেখি 'বিস্ময়' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬-এ 'নবশক্তি' পত্রিকায় আর 'তমোনাশের মন' গল্পটির প্রকাশ ১৯৪৬-এ আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয় আলোচনা'তে। দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধানে এই

দুটি প্রকাশকাল থেকে তেমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না তবে সমালোচকের মত অনুসারে বলা যেতে পারে এই দুটি গল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়—'অদ্বৈতর তন্ময় নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী',—'তার চোখ যে ছবি দেখে তাঁর কলম তা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলে।'

'আশালতার মৃত্যু' লেখকের শেষ গল্প বলেই স্বীকৃত। ১৩৩৫ সালে 'একাল শারদীয়া' পত্রিকায় এ গল্পের প্রকাশ। 'আশালতার মৃত্যু' গল্পটির তিনটি পর্যায়। তিনটি চরিত্র—আশালতা এখানে প্রতীক চিত্র রূপে অঙ্কিত। এক আশালতার ছিল 'বিবাহ' নামক শব্দটিকে ঘিরে এক মধুর স্বপ্ন; দ্বিতীয় আশালতার রঙিন বসন দারিদ্র্যের কবলে পড়ে 'ন্যাকড়া' হয়ে গেল আর তৃতীয় আশালতার ছিল সন্তানের স্বপ্ন। সন্তানকে কোলে নিয়ে মা যশোদার ভাব ফুটে উঠত তার। এ গল্পের তিন নারীর জীবন চিত্রণে গল্পকার তুলে ধরেছেন স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা, হাহাকার ও অবশেষে মৃত্যু। বিয়ে শব্দটাকে একজন দেখে 'অচেনা পুলকের আমেজ' হিসেবে; আর সে বিয়ের ঐশ্বর্য চোখ ধাঁধানো; তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে অল্প—'অবিশ্রাম, অফুরন্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হচ্ছে, অবিশ্রাম জনস্রোত আসছে আর খাচ্ছে, খাচ্ছে আর খাচ্ছে। তিন দিন তিন রাত এমনি করে চলেছিল।'

কিন্তু এত খাবার গেল কোথায়? আঞ্চলিকতার বাতাবরণ আর লোককথার অনুসঙ্গে নির্মিত হয়েছে এ গল্পের কথনশৈলী। আশালতার বিয়ের সময়ে অন্নের সেই প্রাচুর্য শেষ পর্যন্ত অন্নহীনতায় গিয়ে পৌঁছেছে আর শেষ পর্যন্ত ক্ষুধাজনিত কারণে মৃত্যু। গল্পের সময়কালটিও লক্ষ করার মতো; স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল। কিন্তু তার পরিণতিতে বর্ষিত হয় লেখকের তীক্ষ্ণ শ্লেষ সরকারের বিরুদ্ধে। দেশের কর্মহীনতা বা অর্থাভাব এতই প্রকট যে গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে আশালতাকে পাই তার পরনের বস্ত্রের অভাবে লজ্জাহীনতার বেদনা আর বস্ত্রের এমনই অভাব যে ছিন্ন শাড়ি শত ছিন্ন হয়ে যায়, পুরুষ তার স্ত্রীর লজ্জা নিবারণ করতে পারে না। এ হেন অবস্থায় নারী নিজের লজ্জা রক্ষার্থে যখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, তখনও সরকার স্বীকার করে না নিজের ব্যর্থতাকে—এমনই পরিহাস ধ্বনিত হতে থাকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের গল্পে আর এ গল্পের শেষ আশালতা নিজের সন্তানকে যথেষ্ট পরিমাণে আহার দিতে না পারার বেদনায় গুমরে মরেছে; দেশ ভাগের বেদনাকেও প্রকাশ করেছেন গল্পকার—বর্ণনায় ঝরে পড়ে কাব্যিক মাধুর্য—'আশালতার চোখের পাতা ভিজে আসে। যেন হরিণের চোখে জাগে অরণ্যের স্বাদ।' নিদারুণ দুঃখে ও হতাশায় আশালতার আত্মহত্যার ক্ষেত্রে সরকার এক্ষেত্রেও হস্ত উত্তোলন করে দিয়েছে ও মৃত্যুর কারণ হিসেবে আশালতার সঙ্গে স্বামীর কলহকেই কারণ বলে দেখিয়েছে। গল্পের শৈলীটি কিন্তু অন্যরকম একেবারে। প্রথমত তিনটি নারীর ক্ষেত্রেই 'আশালতা' নামটি যেন রূপকের ব্যঞ্জনা পেয়েছে। আশাকে অবলম্বন করেই বাঁচা আর সেই আশারূপ লতা কিভাবে সমাজের ব্যর্থতায় ভূপাতিত হয়ে গেছে, তারই আলেখ্য এ গল্পে বর্ণিত। আর যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তা হল সংগীতের প্রতি তাঁর এক অমোঘ টান প্রকাশ পেয়েছে ছোটোগল্পে আর আঞ্চলিক পালা পার্বণ ও লোক জীবনে প্রচলিত সংগীতকে তিনি অবলীলায় স্থান দিয়েছেন এই করুণ কাহিনির মাঝে—

কেশ যে পাকিল, দন্ত যে নড়িল
যৌবনে পড়িল ভাঁটি।
দিনে না দিনে খসিয়া পড়িল
রঙ্গিলা দালানের মাটি।।

অথবা, বিবাহ প্রসঙ্গে প্রচলিত আঞ্চলিক ছড়াটি—

মা দিল শঙ্খ শাড়ী, বাবা দিল কইয়া
কতটা টাকা লইয়াছ গো বাবা দূরে দিতে বিয়া
দূরের জামাই উড়ে এল টোপর মাথায় দিয়া।

এই আটটি গল্প ছোটোগল্প হিসাবে কতখানি সার্থক, তা বিচার করবে মহাকাল। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই সহজাত কবিত্ব শক্তি ও সংগীত প্রেমের স্বাক্ষরে গল্পগুলি উৎকর্ষতার দাবি করতে পারে। বিশেষত শেষ যে চারটি গল্পের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কিন্তু সাংগীতিক সুরমূর্ছনার পরিচয় পাই। সেই সঙ্গে তাঁর গল্পের মধ্যে খুঁজে পাই লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহককে। তাঁর গল্পে যে চরিত্রের বিচরণ দেখি, তারা সকলেই পাড়াগাঁয়ে লালিত; একথা তো ভুললে চলবে না, অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজে ছিলেন মালো সম্প্রদায়ের একজন; পরবর্তীকালে তিনি নগর কলকাতায় বসবাস শুরু করলেও তাঁর মূল থেকে যে তিনি বিচ্ছিন্ন হননি কখনই, তারই প্রমাণ এই ছোটোগল্পগুলি। সাধুবাক্যে লেখা এই গল্পগুলির মেদুর ভাষাভঙ্গি পাঠককে ক্লান্ত করে না, বরং অন্ধকার তিমির গর্ভে নিমজ্জিত অচেনা রত্নটিকে দেখে হৃদয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর রচিত ভাষার অনুসরণেই বলতে পারি, যেন তাঁর গল্প পাঠ শেষে অবস্থা হয় এমন—'উৎসব শেষ হইয়া গেলে বাড়ির অবস্থা যেমনটি হয় দুপুরের রোদ ঝাঁঝাঁ করে, পশ্চিম দিক্‌কার অন্তহীন মাঠটা জ্বলিতে থাকে'...হাহাকার করে ওঠে মন।

গ্রন্থঋণ

১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস ভূমিকা
২. অগ্রন্থিত মল্লবর্মণ, উপস্থাপনা, পৃ.৯
৩. ওই, পৃ.১৪
৪. ওই, পৃ.২৬
৫. ওই, পৃ.২৭